ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ

দুর্গাদাস মিদ্যা

সুবোধ ঘোষ- এর জীবনের ব্যাপ্তি ১৯০৯ - ১৯৮০। এই একাত্তর বছরের জীবনে প্রথম বেশ কয়েকটা বছর একেবারে বন্ধ্যা। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ার ফলে এবং একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে হিসেবে কৈশোর উত্তীর্ণ অবস্থায় 'উপায়ের কিছু ব্যবস্থা' করতে সংসার ছেড়ে চলে যায় এবং নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। ফলে অভিজ্ঞতার ভান্ডার ছিল একেবারে টইটম্বুর। এই অভিজ্ঞতাই যে সাহিত্যিক হওয়ার পিছনে একমাত্র মাপকাঠি তা নয়, তবুও তিনি বাংলাসাহিত্যের একজন বরেণ্য ও স্মরণীয় সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। বড় অদ্ভুত জীবনী তাঁর। তাঁর কর্মজীবনের খতিয়ান দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। টিকা বা ইনজেকশন দেওয়ার চাকরি থেকে শুরু করে বাস কন্ডাক্টারি পর্যন্ত করেছেন। তার ভিতর যে ছটফটানি ছিল তার সাথে একমাত্র তুলনীয় বর্ষার নতুন জলে মাঝের ডিম ছাড়ার ছটফটানি।

সাহিত্যিক হবেন এ ভাবনা তাঁর কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু আকস্মিক ভাবে তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে হাজির হলেন। ফলে আজ আমরা তাঁর শতবর্ষে তাঁরই রচিত সাহিত্যকর্ম নিয়ে জাবর কাটছি। কী অসামান্য প্রতিভাধর ছিলেন তিনি, না হলে প্রথম গল্পেই বাজিমাত করলেন কি করে! এই যে প্রথম গল্প, যা শিরোনাম 'অযান্ত্রিক', তার জন্মটাও কেমন অসম্ভব বিস্ময়ের। নানা ঘাটে তরী বাইতে বাইতে এসে ঠেকলেন গৌরাঙ্গ প্রেসে। সেখান থেকে আনন্দ বাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এখনকারই কয়েকজন বন্ধুর সাথে 'অনামী সংঘে' যাওয়া আসা। এই যাওয়া আসল কারণ খুব গৌণ ছিল। শুধু ভোজনানন্দে যাওয়া আসা। ওখানে যাঁরা যেতেন তাঁদের মধ্যে চুক্তি ছিল সাহিত্য আলোচনা এবং নিজেদের লেখাপাঠ। বেশি দিন ফাঁকি দেওয়া গেল না। একদিন সুবোধবাবুকেও কিছু পাঠ করে শোনাতেই হল। তিনি লিখে ফেললেন একটা গল্প। এবং পড়লেনও। সেই অভাবনীয় সময়ে তাঁর অনুভূতির কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন, - 'আজ আমরা অগ্নিপরীক্ষা। এতদিন বিনা লেখায় সাহিত্যবাসরে খাবারে ভাগ বসিয়ে যে পাপ করেছি তাকে যোগ্যতার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে আজ। পড়া শুরু করলাম। আধঘন্টারও কম। কয়েক মিনিট স্তব্ধতা। আমি রুদ্ধবাক, বিচারের রায়ে কী শাস্তিবিধান হবে জানি না। কয়েকমুহূর্ত পরেই প্রশংসার জলোচ্ছ্বাস। আজও মনে পড়ে সেই গুঞ্জনধ্বনি'। সেই গল্পের নাম - অযান্ত্রিক। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় স্থান পেল সেই গল্প। অজস্র অভিনন্দন। রাতারাতি কী যেন ঘটে গেল। অনেকটা বায়রনের কবিতার মত—I woke up one morning and found myself famous । রবিঠাকুরের কথায় নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। অনাবিষ্কৃত প্রতিভার আবিষ্কার হল। সেই দিনই বাংলা সাহিত্য পেল আর এক বরেণ্য সাহিত্য সেবককে। আমরা সমৃদ্ধ হলাম। সেই 'অযান্ত্রিক' গল্পের পটভূমি তিনি পেয়েছিলেন বাস কন্ডাক্টারের কাজ করার সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে।

সুবোধ ঘোষের সাহিত্য কীর্তি নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের দুর্বলতার দিকটি আলোকিত করতে চাই।

বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে অনেক নামকরা কুশীলবের কথা আছে এবং তাঁদের কথা শুনতে শুনতে মনে হয় আমাদের দীনতার সীমা পরিসীমা নেই। আসলে খুব সূক্ষ্ম বিচারে যদি আমরা আমাদের সাহিত্য ভান্ডারের অতল গভীরে খোঁজা শুরু করি, তবে বোধ হয় আমাদের এই দীনতার কোনো কারণ থাকার কথা নয়। কারণ অতুল পরিমাণ সম্পদ লুকিয়ে আছে এই বঙ্গ সাহিত্যের ভান্ডারে। বিশেষ করে ছোটগল্পে। অথচযখনই সাহিত্য নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা হয় তখনই দেখি বিদেশী সাহিত্যিকদের টেনে নিয়ে আসা হয়। তা না হলে যেন আলোচনার সার্থকতা থাকে না। উজাগর পত্রিকার সুবোধ ঘোষ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। 'গল্পের তুক ও সুবোধ ঘোষ' প্রবন্ধে মানস কুমার মণ্ডল লিখেছেন ''এ সব সত্ত্বেও বাংলা ছোট গল্পের প্রকরণ - শৈলী - বয়ন সংক্রান্ত আলোচনার নিজস্ব আকার তেমন কি কিছু নেই যা আমাদের বাংলা গল্পের পরম্পরাকে বুঝতে সাহায্য করে। সমালোচনায় পাশ্চাত্য সমালোচকদের নানা প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত সমূহে মোহাবিষ্ট হয়ে পরম মমতায় তাকে দর্পণ হিসেবে ব্যবহারে প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ জনজীবনের বাস্তবতায় যে গল্প প্রতিদিন ঘটে চলে অথবা যার উপাদান আমাদের দুপাশে গড়াগড়ি যায় চূড়ান্ত অবজ্ঞায় তার বয়ন তো বাংলা ছোট গল্পের নিজস্ব ভূগোল - ইতিহাসেরই নির্মাণ শিল্প— একথা আমরা কে না জানি''। এ যেন 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' গোছের ব্যাপার। তা না হলে যেকোন লেখকের ছোট গল্পের উৎকর্ষতা ব্যাখ্যা করতে বিদেশী গল্পকারদের কাছে আশ্রয় নিতে হবে কেন? জানি না বিদেশে তাদের কোনো স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের দেশের কোনো লেখকের উদ্ধৃতি নিয়ে তারা আলোচনা করেন কি-না। ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে লাভ নেই। আলোচনার বিষয়ে ফিরে আসি। সুবোধ ঘোষের গল্প সংখ্যা প্রায় একশ ষাট। এই নিবন্ধে আমরা তাঁর গুটি কয়েক গল্প নিয়ে আলোচনা করব, যা থেকেই বোঝা যাবে সুবোধ ঘোষ কোন পর্যায়ের কারিগর। 'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা নিয়ে' সুবোধ ঘোষের গল্পের বুনন। তার মধ্যে যে জীবনবোধে সত্যছবি উঠে এসেছে তা অবহেলা করার মত নয়। 'জতুগৃহ' গল্পে দেখা যায় বাস্তব সমস্যার জীবন চরিত্র। বিবাহ বিচ্ছিন্ন স্বামী স্ত্রীর গল্প। এ গল্প পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যেতে হয় লেখকের সাথে গল্পের নায়ক - নায়িকার মনোবেদনা বা উপলব্ধির নৈকট্য দেখে। নর নারীর রহস্যময় মনোজগতের এক নিবিড় উপলব্ধির চিত্র তুলে ধরেছেন সাবলীল স্বকীয়তায়। গল্প রচনার প্রারম্ভেই এমন একটা আমেজ তৈরি করেছেন যাতে পাঠক মন্ত্রমুগ্ধের মত আবিষ্ট থাকেন। গল্প শেষ না করে উঠতে পারবে না। গল্প বলার ধরণটাও অন্যরকম। একটা জার্ক দিয়ে গল্পের শুরু। ''এত রাত্রে কোন্ একর ট্রেন''? এই শীতার্ত বাতাস, অন্ধকার আর ধোঁয়া ধোঁয়া বৃষ্টির মধ্যে যেন ট্রেনটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রাজপুর জংসনের প্ল্যাটফর্মের গায়ে লাগানো''। এই চিত্রপট তৈরির যে মুন্সিয়ানা, গল্প বলার যে ভঙ্গি তা থেকেই খুব সহজেই বোঝা যায় সুবোধ ঘোষ কোন শ্রেণির গল্পকার! একথা তো মানতেই হবে গল্প চলার বা বলার একটা ধরণ আছে। সেই ধরণ পুরোপুরি রপ্ত করেছিলেন সুবোধ ঘোষ।

দুটি ভালোবাসাহীন মানুষের মধ্যে যে বিরোধিতার এবং বিপন্নতার ভাব বা লক্ষণ দেখা যায় ভাষার সৌকর্যে তাকে এমনভাবে পাঠকের সামনে লেখক উপস্থিত করেছেন, যা থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় দুজনের মনের মধ্যে কি তোলপাড় চলছে, উদাহরণ দিলেই বিষয়টা বোঝা যাবে। - জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে মাধুরীর মনে হয়েছিল অস্তাচলের মেঘে এই ক্ষণিকের রক্তিমা নিতান্ত অর্থহীন, একটা অলক্ষুণে ইঙ্গিত। আর একটু পরেই তো অন্ধকারে সব কালো হয়ে যাবে। এই ছলনার খেলা আর না করে সূর্যটা যদি একটু তাড়াতাড়ি ডুবে যায়, তবেই ভালো।' এই কথাগুলোর মধ্য থেকে যেটা বেরিয়ে এল তা হচ্ছে মাধুরীর নিষ্কৃতি পাওয়ার মানসিক আকাঙ্ক্ষা। অন্ধকার অর্থাৎ বিচ্ছেদ যখন সম্পূর্ণ তখন আর মিছে ছলনার আশ্রয় কেন? এখন তো ভালোবাসার কোন লক্ষণ নেই। ভাঙা মন জোড়া লাগে না ঠিকই তবুও কিছু স্মৃতি, কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা একেবারে মুছে ফেলা যায় না কিছুতেই। কারণ মন তো আর কঠিন পাথর নয়। একটা দুটো দাগ থেকেই যায়। এই গল্পের বিষয় সেই দাগগুলো, যা শত চেষ্টাতেও দুজনের কেউই মুছে ফেলতে পারেনি। তাই মাধুরী দেখছে শতদল যেন আগের থেকে রোগা হয়ে গেছে। শতদল দেখছে মাধুরীর আঙ্গুলগুলো যেন আগের থেকে সরু হয়ে গেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হলেই যে স্মৃতি বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় না এ কথাই লেখক তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন এই

গল্পে। এটা যদি না থাকত তবে 'জতুগৃহ' নামকরণের কোন তাৎপর্য থাকত কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। গল্পের শেষে যে চমক রয়ে গেছে তা গল্পের উৎকর্ষতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অতএব খুব সহজেই বলা যায় এই গল্প সবার্থে সার্থক গল্প। এই গল্প নিয়ে আরও অনেক বলার থাকে কিন্তু সব কথা বলার মত পরিসর পাওয়া যায় না সব সময়।

'মান - শুল্কা' গল্প যাদের পড়া আছে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'আগো'কে। তবে গল্পটা পড়তে গিয়ে একটা খটকা লাগলো যখন শুরুতেই লেখক বলছেন - 'ট্রাফিকের বড় সাহেব মাঝে মাঝে তাঁর শিকার করা বাঘের শবটাকে স্টেশনের মুশাফির খানায় শুইয়ে রাখতেন...।' এই তুলনা কতটা প্রাসঙ্গিক তা ভাবতে গিয়েই খটকা লাগে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'আগো' আর যাই হোক বাঘ নয় তা সে জ্যান্তই হোক বা মৃত। তবে যদি মানুষের কৌতূহলের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে এই উপমার আশ্রয় নিয়ে থাকেন তাহলে হয়ত কিছুটা দ্বিধার হাল্কা আস্তরণ বিচার বিশ্লেষণের ফাঁকে জড়িয়ে থাকে। যে কোন মানুষের, তা সে সমাজের যে স্তর থেকেই উঠে আসুক না কেন, তার একটা ন্যূনতম মর্যাদা আছে। সেই মর্যাদার যদি একটু আঘাত কেউ করে অথবা মর্যাদা কেড়ে নিতে চায় তাহলে সে আর মানসিক ভাবে মানুষ থাকে না। থাকতে পারে না। তখন শুধু রোধহীন, অনুভূতিহীন দেহটাই পড়ে থাকে। ঠিক সেই চিত্রই এঁকেছেন ভাগ্যতাড়িতা কুড়ি বছরের মহিলা মজুর 'আগো' -র ক্ষেত্রে। এটা একান্তভাবেই স্বাভাবিক চিত্র যা লেখকের অনুভূতিতে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে লেখকের দৃষ্টি শক্তির প্রশংসা করতেই হয়।

সভ্যতা নাকি এগিয়ে চলেছে। সভ্যতা তো আর আপনা - আপনি এগিয়ে চলতে পারে না। সভ্যতাকে এগোতে হলে তার মাধ্যমে অর্থাৎ মানুষকে এগিয়ে চলতে হয়। মনুষ্য সমাজ যে এখনও আদি সত্ত্বার মধ্যেই রয়েছে তা তাদের জৈব ক্ষুধা দেখলেই বোঝা যায়। 'আগো' একটি বোধহীন দেহ যেন, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের বর্ণনায় - 'থানার দারোগা দিয়েছেন এই কাপড়। কারণ ওর কাপড় - চোপড় দুদিন আগেই এক কলঙ্কিত হেফাজতে ওর দেহটা চলেছে সদরে'। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ওর বোধ বলে আর কিছু নেই। এই কয়েকটি কথার মধ্যে দিয়ে লেখক সচেতন ভাবে 'আগো'র বিধ্বস্ত মনের ছবিটা তুলে ধরেছেন পাঠক সমক্ষে। 'আগো' যে মানুষ এখন কথাটা যেমন জনতা মানতে চায়নি, তেমনই সেপাইরাও মনে করেনি। ওরও যে লজ্জা শরম থাকতে পারে অথবা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য যে আব্রুর প্রয়োজন সেইটুকু বোধবুদ্ধি বা বিচারশক্তি বোধহয় তথাকথিত সভ্য সমাজ বিস্মৃত হয়ে যায় এই সমস্ত অসহায় অপরাধিনীদের ক্ষেত্রে। তাই প্রতিবাদ না করে পারে না 'আগো'। সেই রাগ যে কতটা যুক্তিযুক্ত তা লেখক খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন অল্প কয়েকটি কথায়, '...আগো বাইরে যেতে চায় প্রকৃতির ডাকে। কিন্তু যেহেতু ও আসামী তাই নিজের ইচ্ছেমত যাওয়ার স্বাধীনতা ওর নেই। তাই কাছাকাছি অর্থাৎ সেপাইদের সামনেই কর্মটি সারতে হবে যা একেবারেই সম্ভব নয় যুবতী মেয়ের পক্ষে। তারই প্রতিবাদে আগো গর্জে ওঠে- রুষ্ট সাপের মত আগোর চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। চেঁচিয়ে বলে, আমাকে গরু পেয়েছ নাকি?'

এই গল্পের পরিণতিতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি শেষ পর্যন্ত মানবিকতারই জয় হচ্ছে। টের পাওয়া যায় সমাজ সচেতন লেখকের গঠনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। এখানেই লেখকের মহানুভবতা অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়।

নানা ঝড় ঝাপটা সহ্য করে যখন প্রায় হতাশ আগো এই এত বড় শহর কলকাতায় মানুষের দেখা পায় না, ঠিক তখনই দেবদূতের মত এসে গেল একজন মানুষ যে সমাজে গুন্ডা বলে স্বীকৃত। সেই এগিয়ে এল মানবতার প্রদীপ হাতে আগোকে বাঁচাতে। সে ধরা পড়বে জেনেও আগোকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাঁচালো নরপশুদের হাত থেকে। প্রমাণিত হল মানবতার মৃত্যু নেই। জয় হল মানবিকতার।

সুবোধ ঘোষের জীবন বৈচিত্র্যে ভরা। নানা ভাবে চলতে চলতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছিলেন। তাই তাঁর জীবনের যাত্রাপথের কাছে ফিরে যেতেই হয়। কারণ লেখকের লেখাকে চিনতে হলে তাঁর জীবন যন্ত্রণার সাথে পরিচিত হতে হয়। লেখকের জীবনের গতিবিধির ওপর আলোকপাত করতে হয়। যে লেখকের জীবন যন্ত্রণার বোধ যত বেশি, তিনি তত বেশি সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি করে গেছেন। যিনি যত বিখ্যাত হয়েছেন তিনি তত কষ্ট ভোগ করেছেন তাঁর জীবৎকালে। 'থাকবো না এই বন্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে' এই যাঁর জীবনদর্শন, তিনি যে একজন অসামান্য সাহিত্যকার হবেনই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সুবোধ ঘোষ সম্বন্ধে এই কথা একশো শতাংশ সত্য। তিনি কী না করেছেন! জীবনের হার্ডল পেরোতে পেরোতে অজস্র বিচিত্র অভিজ্ঞতার মণিমুক্তো সঞ্চয় করেছেন আর তার দ্যুতি ছড়িয়েছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে, যা পড়ে পাঠকরা স্তম্ভিত না হয়ে পারে না।

সুবোধ ঘোষের সাহিত্যিক হয়ে ওঠার গল্পটাই যেন একটা গল্প। সে কথা আগেই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' যা তাঁকে প্রথমেই স্বীকৃতির শিরোপা পরিয়েছে। এ গল্পের বিষয়বস্তু তাঁর সংগ্রামী জীবনের একদম পরীক্ষিত সত্যের জবানবন্দি। এই গল্প সম্বন্ধে আমরা বিশিষ্ট দুজন মানুষের মতামত একটু জেনে নেব। সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্পের সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'অযান্ত্রিক' -এ, যন্ত্রযুগ্ধ যেন কথা কয়ে উঠল! জড়ে আর জীবে, মন্ত্রে আর মানষে এ যুগের জীবন যে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত, এই সত্যই যেন নতুন করে উদ্ভাসিত হল এই গল্পে'। এই অভিমত থেকে একটা সুস্পষ্ট হয় যে 'অযান্ত্রিক' একটি কালোত্তীর্ণ গল্প। আজকের সভ্যতা, প্রত্যহিক জীবন যন্ত্র ছাড়া একেবারে অচল। এই উপলব্ধির সন্ধান লেখক দিয়েছেন 'অযান্ত্রিক' গল্পে। এই সত্য তাঁর জীবন থেকে নেওয়া।

লেখকের আর একটি গল্প আমাকে চমকিত করেছে, তার 'অঙ্গ' রচনায় ও উপস্থাপনায়। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল গল্পের চরিত্র অটলনাথ যেন বর্তমান সমাজের মূল্যবোধ অবক্ষয়ের একটি প্রাণবন্ত উদাহরণ। স্বার্থপর, আত্মসুখী এবং আত্ম প্রচারোন্মুখ এক বিকৃত মনস্ক মানুষের জীবন্ত উদাহরণ অটলনাথ। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যত ঘৃণ্য পথ ধরা দরকার তাতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ নাই। গল্পের নাম 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ', অর্থাৎ টাকা দিয়ে যা সিদ্ধ করা বা করানো যায়। এই গল্প কি আজকের গল্প নয়? 'কান্তিকুমার' যে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাকে নিয়ে যে ছেলেখেলা করেছেন অটলনাথ আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, তা বর্তমান সময়ে প্রায়ই চোখে পড়ে। এখানে লেখক অন্তর্দ্রষ্টা ঋষির মত। আগামী কালে কি ঘটতে চলেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন এই গল্পে। ক্লীব মধ্যবিত্তের যে ছবি আমাদের দৈনন্দিন চোখে পড়ে তার উদাহরণ কান্তিকুমার, যে ভীরু - কাপুরুষ, প্রয়সীর কাছেও, তার দাবিকেও শিক্ষিত কান্তিকুমার তুলে ধরতে পারেন। মেরুদন্ডহীন, তাই তাকে শুধু অর্থের ইশারায় নরকে টেনে আনেন অটলনাথ। কিন্তু বাঁচার মন্ত্র জানে না কান্তিকুমার। ওর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে অটলনাথ সমাজের কেউকেটা হয় আর কান্তিকুমার তলিয়ে যায় হতাশার গভীর অন্ধকারে। এই গল্পের ট্রিটমেন্ট ভাবলে অবাক হতে হয় জীবন সম্বন্ধে কী গভীর বোধ এই গল্প না পড়লে উপলব্ধি করা যায় না। সুবোধ ঘোষ চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এই সমস্ত গল্পের জন্য। একজন মহৎ সাহিত্যিকের প্রধান কাজ সমকালীন সমাজকে তুলে ধরা কিন্তু তাঁর লেখনির কুশলতায় তা যেন পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন। আজ শত বর্ষের উজ্জ্বল অঙ্গনে দাঁড়িয়ে খুব সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে সুবোধ ঘোষ কত বড় স্রষ্টা ছিলেন। 'অযান্ত্রিক' দিয়ে শুরু করে সমাজের সমস্ত স্তরকে ছুঁয়ে গেলেন অবলীলায়।

দুঃখের কথাও কিছু থেকে যায়, যখন দেখি একজন সাহিত্যিক তাঁর যথার্থ মূল্য পান না সাহিত্যিক রূপে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে। যাঁরা এই প্রেক্ষিতে বিচার করেন তাঁর সাহিত্যিক মর্যাদা কতটা ক্ষুণ্ণ করেন জানিনা, তবে এটা জানি যাঁরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মূল্য দিলেন না তাঁরই সংকুচিত হলেন তাঁদের মানসিক ঔদার্যহীনতায়।